

শরৎ-উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ

‘যোগাযোগ’ বা ‘ঘরে বাইরে’ বা ‘মালঞ্চ’ নিবিড় পাঠের প্রেক্ষিতে বলা যায়, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রের তুলনায় কিঞ্চিৎ আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ যেখানে ব্যক্তির নিজস্ব সংকট ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় দূরত্বকে বৃহত্তর আর্থ সামাজিক ভিত্তির নিবিড় অনুধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠা দেন, শরৎচন্দ্র সেখানে নির্ভর করেন ভাবাদর্শ ও আবেগ-বাহুল্যের ওপর। অবশ্য বাঙালি সমাজের বর্ণাভিমান ও তজ্জনিত দূরত্বও শরৎসৃষ্টি চরিত্রের মূলে সক্রিয় থাকে। আর সক্রিয় থাকে সামন্ত তান্ত্রিক সমাজের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সম্পর্কের নানা স্তর। শরৎচন্দ্র ব্যক্তি-পাত্রের আবেগ ও তার বিশেষ ধর্মীয় আদর্শকে গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিতে গোটা মানুষটাকে যুক্তি পরস্পরায় দেখেছেন, শরৎচন্দ্র সেখানে বন্দী হয়ে পড়েছেন ব্রাহ্ম-বিদ্বেষের ঘেরাটোপে। ফলে, বর্ণভেদের সামাজিক সমস্যা বা সামন্ততন্ত্রের অত্যাচারী রূপ শরৎ-উপন্যাসে যতটা বিশ্বস্তভাবে রূপায়িত হয়েছে, দাম্পত্য-সমস্যা ততখানি নয়। ‘চরিত্রহীন’ বা ‘শেষপ্রশ্ন’— কোনো উপন্যাসেই দাম্পত্য-সমস্যার মতো একান্ত নিবিড় ব্যক্তিগত সমস্যাকে তিনি গভীরভাবে ভেতর থেকে দেখেননি, দেখেছেন বাইরে থেকে। ফলে আরোপ-জনিত সমস্যা এবং জীবনবোধের ঘাটতি এসবক্ষেত্রে শৈল্পিক ত্রুটি রূপে দেখা দিয়েছে। সাহিত্য সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন—

“রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাস বিংশ শতকের সূচনায় অনেক বেশি সামাজিক ও জাতীয় জীবন-নির্ভর হয়ে উঠেছে। শিল্পজাত ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, সামাজিক সমস্যা এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা বঙ্কিমের যুগের তুলনায় তীব্রতর হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপারে একথা যতটা সত্য, সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে হয়তো ততটা সত্য নয়। কারণ, যে পতিতা ও বিধবার সমস্যা, সতীত্বের সমস্যা এবং দাম্পত্যের সমস্যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের বিষয়বস্তু হয়েছে সেগুলি বঙ্কিমের আমলেও ছিল, তবে তাদের দুঃসাহসিক ও গভীরতর উপস্থাপন-পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব। সমকালীন বিভিন্ন দেশের উপন্যাসিকদের রচনা-পদ্ধতি ও মোহমুক্ত বিচারবুদ্ধি নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথ ও

শরৎচন্দ্রকে এই পূর্ব-প্রচলিত সমস্যাগুলিকে মোহমুক্তি দৃষ্টিতে বিচার করতে সাহায্য করেছে। অন্যান্য কতকগুলি সমস্যা — যেমন, দাম্পত্য জীবনের নতুন অধিকার-ভিত্তিক সম্পর্ক, নারী মুক্তির সমস্যা, দেহসম্পর্কহীন সতীত্ব, যৌন সমস্যা, মুক্ত প্রেম, বোহেমিয়ান উচ্ছৃঙ্খলতা... পরিবার ভাঙনের স্বরূপ ইত্যাদি নানা সামাজিক সমস্যা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে উপন্যাসিকদের বিশেষভাবে যে আলোড়িত করেছে তা বিংশ শতকের সমাজচিন্তা ও সামাজিক পরিবর্তনেরই ফল।”

দাম্পত্য সমস্যা, স্বামী-স্ত্রীর দূরত্বজনিত বা বোঝাপড়ার ঘাটতি-জনিত সমস্যা ও তজ্জনিত চরিত্রের সঙ্কট শরৎচন্দ্রের তিনটি উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে — ‘গৃহদাহ’, ‘চরিত্রহীন’ ও ‘শেষপ্রশ্ন’। এর মধ্যে ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসটিই শ্রেষ্ঠ। অচলার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়তার অভাব, দুই পুরুষের প্রতি তার নারী হৃদয়ের টানাপোড়েন এ উপন্যাসে সমস্যার মূল। পাশাপাশি নায়ক মহিমের অতিরিক্ত শীতলতা ও নিষ্ক্রিয়তা ও সুরেশের অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-বাহুল্যও এ উপন্যাসের দাম্পত্য-সমস্যাকে পুষ্ট করেছে। কিন্তু চরিত্র চিত্রণের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব, আকস্মিকতা তথা নাটকীয় পরিস্থিতি সৃজনের দিকে শরৎচন্দ্রীয় ঝোঁক লেখককে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে দেয়নি। সমালোচকগণ অচলাকে ‘অস্থিরমতি’ চরিত্র বলেছেন। আবার শেষপ্রশ্ন উপন্যাসটি যতটা তর্কবহুল, ততটা প্রাণবন্ত নয়। ‘শেষপ্রশ্ন’ উপন্যাসের নায়িকা কমল প্রচুর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, অনেক তর্ক করেছে, কিন্তু প্রাণধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কমল ও কিরণময়ী যেসব সমস্যা বা প্রশ্ন পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছে, তার মূলগত ভিত্তি হল যৌনতায় নারীর অধিকার এবং সে অধিকার প্রতিষ্ঠায় বা সম্ভোগে পুরুষ আধিপত্যের চাপিয়ে দেওয়া সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার। নারী-স্বাধীনতা বলতে কমল ও কিরণ দুজনেই প্রধানতঃ যৌন-স্বাধীনতাকে বুঝেছে। সামন্ত তান্ত্রিক সমাজে, নারীর আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্ন থেকে যৌন স্বাধীনতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা উচিত নয়। ফলে, এই দুটি উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের অবস্থান সাহসী হলেও তাঁর পর্যবেক্ষণ নিবিড় ও ত্রুটিহীন একথা বলা যায় না। তবে, কমলের তুলনায় কিরণময়ী অনেক বলিষ্ঠ চরিত্র, একমাত্র কিরণকেই প্রাণধর্মে প্রতিষ্ঠিত চরিত্র বলা যায়। কমল যতখানি তार्কিক, ততখানি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রাণবন্ত চরিত্র নয়।

দাম্পত্যের ভিত্তি হল বিবাহ। হিন্দু বিবাহ-ঐতিহ্যে দেখা যায়, বিশেষতঃ প্রাক-স্বাধীনতা যুগে, দুটি অপরিচিত নর-নারীর মধ্যে বিবাহ নামক লোকাচারের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন। বোঝাপড়া ভালোভাবে গড়ে ওঠার আগেই শারীরিক সম্পর্ক, তারপর বোঝাপড়া তথা সমন্বয় ও একত্রবাসের পরিসর তৈরি হয়। পাশ্চাত্য বিবাহ-আদর্শের একেবারেই যা পরিপন্থী ; এমনকি, বাংলাদেশে ব্রাহ্ম আন্দোলন জনপ্রিয় হওয়ার যুগে ব্রাহ্ম সমাজে প্রাক-বিবাহ মেলামেশা এবং প্রাপ্তবয়স্কা ব্রাহ্ম নারীর স্বামী-নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। ‘গোরা’ উপন্যাসে ললিতা ও বিনয়ের মেলামেশা এবং পানুবাবুর বাগদত্তা হওয়া সত্ত্বেও সুচরিতার গোরার সঙ্গে মেলামেশার ছবি এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে। শরৎচন্দ্র বিধবা নারীর সমাজ-নিষিদ্ধ মেলামেশাকে কিছুটা পরিসর দিলেও প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী নারীর স্বামী নির্বাচনের অধিকার বা প্রাক বিবাহ মেলামেশাকে ঔপন্যাসিক হিসেবে উদারচিত্ত ছাড়পত্র দেননি। এ জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র নির্বাচন ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসের অচলা এবং অচলা ব্রাহ্ম-হিন্দুঘরের প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী মেয়ে, শরৎচন্দ্রের যুগেও খুব সুলভ ছিল না, বিশেষত গ্রামীণ সমাজে। নাগরিক জীবনে দু একটি বিরল ক্ষেত্রে হয়তো হিন্দু ঘরের আঠারো বছর বয়স্কা কুমারী মেয়ে দেখা যেত, কিন্তু তাদেরকে সমস্যার কেন্দ্রে নিয়ে আসার কথা শরৎচন্দ্র ভাবেননি। নাগরিক জীবন নিয়ে তিনি খুব কমই লিখেছেন।

সে যাই হোক, দাম্পত্য-সম্পর্ক নির্মানের যে মূল ভিত্তি, সেই বিবাহ-প্রথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের কাছে অনুসরণীয় আদর্শ ছিল হিন্দু বিবাহের আদর্শ। তাঁর চরিত্ররা এই পথেই হেঁটেছে। এমনকি ব্রাহ্ম অচলাকেও তিনি এই পথ অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন মৃণালের মারফত। একমাত্র কিরণময়ী এবং কমল এই হিন্দু বিবাহ নির্ভর দাম্পত্যের আদর্শকে প্রজ্বলানে বিদ্ধ করেছে। এরা হয়তো সমগ্র শরৎ উপন্যাসের ধারায় ব্যতিক্রম। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র হিন্দু বিবাহ আদর্শ তথা দাম্পত্যের আদর্শকে মান্যতা দিয়েছেন।

বিবাহ যেহেতু সমাজ-অনুমোদিত, তাই বিবাহ-প্রথাকে মান্য করা বিবাহিত নর-নারীর কাছে প্রায় বাধ্যতামূলক। এই মান্যতার মূল্যবোধ কালক্রমে একটা সংস্কারে

পরিণত হয়েছে। সুতরাং বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী যেখানে নানা কারণে পরস্পরকে ভালোবাসতে পারেনি, সেক্ষেত্রেও তারা প্রথা বা সংস্কারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে চায়। বিয়ে ভেঙে দেওয়া বা দাম্পত্যের বিচ্ছেদ অতি আধুনিক যুগের অতিশায়িত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলশ্রুতি।

আধুনিক কালের লেখক হওয়া সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে নারীর অমর্যাদা বা অবমূল্যায়ণ সম্পর্কে প্রতিবাদ মুখরিত হলেও দাম্পত্য বা বিবাহ-আদর্শের ক্ষেত্রে হিন্দু বিবাহের সংস্কার থেকে তাঁর চরিত্ররা মুক্ত হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের মনের মধ্যেই যে প্রচুর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তার প্রতিফলন তাঁর কথা সাহিত্যে পাওয়া যায়, আর এরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হলো তাঁর আধুনিকোচিত দৃষ্টিভঙ্গির অস্পষ্টতা; এই অনাধুনিকতা তথা অস্পষ্টতার জন্যই তাঁর দাম্পত্য-সংশ্লিষ্ট চরিত্রেরা আপন যুগকে অতিক্রম করতে পারেনি। যেমন, ‘দত্তা’ উপন্যাসের ধনী ব্রাহ্মকন্যা বিজয়া ব্রাহ্মসমাজেরই আর এক নিষ্ঠাবান কর্মী বিলাসবিহারীর বাগদত্তা ছিল, কিন্তু নরেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সে সেই পুরাতন প্রস্তাব নাকচ করেছে এবং হিন্দু নরেনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘট্য করে নরেনদের কুলপুরোহিতের মন্ত্রপাঠ শুনে রীতিমত পিঁড়িতে বসে বিয়ে করেছে। এক্ষেত্রে তার যেমন কোন মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেননি লেখক; তেমনি নরেনেরও ব্রাহ্মকন্যাকে হিন্দু-বিবাহের প্রথা মান্য করাতে বাধ্য করানোর ক্ষেত্রে কোনোরকম মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখা যায়নি।

শুধুমাত্র অন্ধ প্রথানুগত্য ও সংস্কারকে মান্যতা দিতে গিয়ে শরৎ-উপন্যাসের অনেক দাম্পত্য সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েও শেষ পর্যন্ত ভাঙনে পর্যবসিত হয়নি। স্বামী হীন চরিত্রের, স্ত্রীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেয় না, তবুও স্ত্রী প্রাণপন স্বামীর সেবা করে দাম্পত্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, শরৎ-উপন্যাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন, ‘শুভদা’ উপন্যাসে স্বামী হারান দুঃচরিত্র, নেশাগ্রস্থ, মনিবের টাকা তহরুপ করে কারাবাসকে বরণ করতে বসেছে, কিন্তু শুভদা সব জেনেশুনেও, গৃহবধূ হওয়া সত্ত্বেও স্বামীকে বাঁচাবার জন্য মনিবের হাতে পায়ে ধরেছে। ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের অনন্যাদিদি

(প্রথম পর্ব) এবং অভয়ার (দ্বিতীয় পর্ব) মধ্যে এ ব্যাপারে মৌলিক সাদৃশ্য আছে। অবশ্য কাহিনির শেষদিকে অভয়াকে বিদ্রোহিনীরূপে দেখিয়ে শরৎচন্দ্র তাকে হিন্দু বিবাহ সংস্কারের বিরুদ্ধে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কাহিনির অন্তিমে এইরকম বিদ্রোহ করবার আগে অভয়া হীনচরিত্র স্বামীর সঙ্গে মিটমাট করে নিয়ে মিলিত হবার প্রভূত চেষ্টা করেছিল। অর্থাৎ শুভদার মতো অভয়াও প্রথমদিকে অসুখী দাম্পত্যকে মেরামত করবার ও টিকিয়ে রাখবার অনেক চেষ্টা করেছে। আবার ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের প্রথমপর্বের অন্নদাও বারম্বার সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রমাণে ব্রতী হয়েছে। অন্নদার স্বামী সাহজীও কাপুরুষ ও দূষচরিত্র, শ্বশুরালয়ে অধিষ্ঠানকালেই সে বিধবা শ্যালিকার ওপর বলপ্রয়োগ করে এবং তাকে হত্যার পর প্রাণে বাঁচতে ধর্ম পাণ্টে মুসলমান হয়। এসব সত্ত্বেও অন্নদাদিদির সতীত্ব অটুট ও নিষ্কলঙ্ক। কারণ, বিধবী অমানুষ স্বামীর সেবাযত্নে মহীয়সী হিন্দু কুলবধূ হিসেবে অন্নদাদিদি প্রভূত দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন। ‘দেনা পাওনা’ উপন্যাসেও মদ্যপ অত্যাচারী স্বামীকে সুপথে ফিরিয়ে আনবার জন্য ষোড়শী অনেক নির্যাতন, অনেক কষ্টসহ্য করেছেন।

একটা আনুপাতিক সমীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, শরৎউপন্যাসে দাম্পত্য-বিচ্ছেদ বা সঙ্কটের তুলনায় দাম্পত্য টিকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টাই বেশি। বিদ্রোহিনী বা গৃহত্যাগিনী স্ত্রী-চরিত্রের তুলনায় মেনে-নেওয়া বা মানিয়ে-নেওয়া স্ত্রী-চরিত্রই শরৎ-সাহিত্যে সমধিক।

বিদ্রোহিনীদের মধ্যে সর্বাপ্রাে মনে পড়বে ‘শেষপ্রশ্ন’ উপন্যাসের কমলকে। কমল তো বিবাহ প্রথার প্রয়োজনীয়তা নিয়েই গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। বস্তুত এটাই তার বিদ্রোহ! একদা শিবনাথ নামক যুবকের সঙ্গে কমলের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু শিবনাথ কমলকে ত্যাগ করে এবং মনোরমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পাণ্টা দান হিসেবে কমলও শিবনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কমলের স্পষ্ট যুক্তি, দু’জনের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসাই যখন আর নেই, ভালবাসা নেই বলে দায়বদ্ধতাও নেই; তাহলে শুধুমাত্র সামাজিক নিরাপত্তার জন্য শিবনাথের স্ত্রী পরিচয়ে বেঁচে থাকা অর্থহীন! এরপর কমল, মানসিকভাবে শিবনাথ-বৃত্ত অতিক্রম করে নতুন করে ঘর বাঁধতে এগিয়ে গেছে অজিতের দিকে। এবার কিন্তু কমল আর আচার-সর্বস্ব বিবাহ-প্রথাকে

মান্যতা দিতে চায়নি। যেভাবে সে বিবাহ-প্রথার পরিচিতিতে অস্বীকার করে অজিতের সঙ্গে একত্র জীবনযাপন করে দাম্পত্যের নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাকে একালের ভাষায় ‘লিভ-টুগেদার’ বলাই যায়। অজিত বারম্বার অনুরোধ করেছে বিবাহের জন্য, সে বিবাহিত দাম্পত্যই চেয়েছিল প্রথাকে মান্যতা দিয়ে, কিন্তু কমল আর নতুন করে কোন বিবাহের বন্ধনে নিজেকে জড়াতে চায়নি। কমল মনে করেছিল বিবাহ একটা আনুষ্ঠানিক আচার মাত্র, তার চেয়ে ভালবাসার মন্ত্রের জোর বেশি! এই নবলব্ধ উপলব্ধির দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই কমল বারম্বার অজিতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। অভয়াও এইভাবে রোহিণীদাদার সঙ্গে বার্মায় পালিয়ে যায়। তার সঙ্গে একত্র বসাবস করে প্রথা-উত্তীর্ণ দাম্পত্যের নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছে। কমল ও অভয়া দু’জনেরই বিবাহিত জীবন ব্যর্থ, তাই বিবাহ-ব্যতিরিক্ত ভালোবাসার জীবনকে তারা জীবনের চূড়ান্ত পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই চরিত্র দু’টিতে শরৎচন্দ্রের আধুনিক জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। অবশ্য কমলের বিপরীতে আশুবাবুর চরিত্রটি সৃষ্টি করে এবং তাঁর মুখে কমলের বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধিতা উপস্থাপন করে শরৎচন্দ্র প্রথাগত হিন্দু দাম্পত্যকেও স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। কোনো কোনো সমালোচক আশুবাবুর বক্তব্যের মধ্যেই বিবাহ-প্রথা ও দাম্পত্য-আদর্শ সম্পর্কে শরৎ-মানসের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে করেন।

আমাদের মনে হয়, শরৎচন্দ্র হিন্দু বিবাহ-প্রথার, তার যাবতীয় সীমাবদ্ধতার পুরোপুরি অবসান চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এই প্রথাটির কিছু সংশোধন করে প্রথাটিকে টিকিয়ে রাখতে। প্রসঙ্গত বলা যায়, শরৎচন্দ্র বিশিষ্ট দার্শনিক বার্টাও রাসেলের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। বার্টাও রাসেলও প্রচলিত বিবাহ-প্রথাকে টিকিয়ে রাখতেই চেয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র ছিলেন একটু বেশিরকম বিশুদ্ধতাবাদী বা Puritan। শরৎচন্দ্রের ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসের মহিম ও অচলার দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা যত গভীর ও ব্যাপক অন্য উপন্যাসগুলিতে ততটা নয়। ছোটো বড়ো, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত ধরলে শরৎচন্দ্রের মোট উপন্যাসের সংখ্যা আটশ টি। মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার দিক থেকে দেখতে গেলে চরিত্রহীন (১৯১৭ খ্রি.) শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব (১৯১৭ খ্রি.), শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৮ খ্রি.) গৃহদাহ (১৯২০ খ্রি.),

দেনাপাওনা (১৯২৩ খ্রি.) শ্রীকান্ত, তৃতীয় পর্ব (১৯২৭ খ্রি.) এবং শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্ব (১৯৩৩ খ্রি.) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম পর্বে লেখা ‘বিরাজ বৌ’ রচনাটিত বিরাজের দাম্পত্যের দ্বন্দ্বময়তায় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টির সম্ভবনা ছিল। কিন্তু শিল্পীমনের নিরপেক্ষতার অভাবে সেই সম্ভবনা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্বের রচনা ‘বিরাজবৌ’। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে দাম্পত্য সমস্যার ছিবি চিত্রিত হয়েছে। এখানে দাম্পত্য সমস্যার চিত্রনের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মনস্তাত্ত্বিক সচেতনতার পরিচয় স্বল্লাভাসে ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হলেও ‘চোখের বালি’ উপন্যাসটির মতো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি এখানে দেখা যায় না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বিরাজ বৌ’ রচনাটিকে তাঁর বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রহে ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ বলে অভিহিত করেছেন। শুধু তাই নয়, বিরাজবৌ এবং নীলান্বরের দাম্পত্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বময়তার আভাসও পেয়ে ছিলেন। “তাহার (বিরাজ) সম্বন্ধে কুৎসিত সন্দেহ-পোষন শুধু দাম্পত্য প্রেমের অবমাননা নহে, ঐকান্তিক সাধনার নির্মল পবিত্রতায় কলঙ্ক-লেপন। কাজেই বিরাজের রোগজীর্ণ, পরিচর্যা ক্লান্ত, আত্মনিপীড়নে বিপর্যস্ত মনে একটা অস্বাভাবিক, অকল্পনীয় সংকল্প মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া খুবই সম্ভব। এক মুহূর্তের রোষকৃত্যায় আত্মহত্যার প্রেরণা অতর্কিতভাবে অকৃতজ্ঞ স্বামীর প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধানের সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হইয়াছে।”^২

শরৎচন্দ্র ভারতীয় সনাতন দাম্পত্যের সতীত্বের সংস্কার সামনে রেখেই বিরাজের চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন বলে মনে হয়। নীলান্বরের স্ত্রী বিরাজের মধ্যে ছিল ভারতীয় হিন্দু নারীর সতীত্বের সংস্কার। সে তার রুগ্ন-স্বামীকে শত অভাব-অনটন সত্ত্বেও মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। তার ভালোবাসায় নারীর মাতৃরূপের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বোন’ উপন্যাসের শশাঙ্কের প্রতি তার স্ত্রী শর্মিলার ভালোবাসায় মাতৃভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিরাজের দাম্পত্য জীবনেও দেখা যায় — স্বামীর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে নিরন্তর দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিয়েই সে তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করেছে।

মাতৃভাবের ভালোবাসায় শশাঙ্কের প্রেমাকাজক্ষা চরিতার্থ হয়নি। তাই শর্মিলার সহোদরা উর্মিলার প্রিয়াভাবের ভালোবাসার প্রতি তার আদিম প্রবৃত্তি অপ্রতিরোধ্য বেগে ধাবিত হয়েছে। নীলান্বরের ক্ষেত্রে এমন কোন অবদমিত আকাজক্ষা তাদের দাম্পত্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেনি। ‘বিরাজবৌ’ রচনাটিতে নীলান্বর বিরাজের কোন আকাজক্ষাকেই পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। উপরন্তু তাদের স্বভাবের মধ্যে ছিল প্রবল বৈপরীত্য। এই অতৃপ্ত আকাজক্ষা অবদমনের গহ্বর থেকে একদিন বেরিয়ে এসে জমিদারের লম্পট পুত্র রাজেন্দ্র প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে চলে আসে।

সংসারের দায়দায়িত্বের প্রতি নীলান্বরের ছিল একপ্রকার ঔদাসীণ্য। বিরাজ তা সহ্য করতে পারতো না। তবুও সন্তানহীন দাম্পত্যে স্বামীর যাবতীয় অক্ষমতা মেনে নিয়েও বিরাজ তাকে আন্তরিকভাবে ভালোবেসে যায় হিন্দু নারীর সতীত্বের সংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে। নীলান্বর বিরাজের যত্র-আত্তি এবং দৈব সংস্কার-উপোস ইত্যাদিকে তার পাগলামি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেনি। উপন্যাসটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় সন্তানহীনা বিরাজের যে সংস্কারকে স্বামীর-পাগলামি বলে মনে করে তার মূলেও রয়েছে স্বামীর কল্যাণকামনায় সতী নারীর বদ্ধমূল স্বামী সংস্কার — “পাগলামি নয় ? আসল পাগলামি ! মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মাতে বুঝতে, স্বামী কি বস্তু ! তখন বুঝতে, এমন দিনে তার জ্বর হলে বুকের ভিতরে কি করতে থাকে।”^৩

নীলান্বরের বেশ কয়েকদিনের জ্বর ভোগের পর স্ত্রীর নিষেধ অমান্য করে মতি চাঁড়ালের মিনতি মেনে তার ছেলে ছিমন্তের প্রাণ বাঁচাতে যায়। বিরাজ স্বামীর কাছে একটু সমাদর একটু গুরুত্ব প্রত্যাশা করে। প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ বিরাজ বলে “তার কান্না দেখলে — কিন্তু আমার কান্না দেখবার লোক সংসারে আছে কি ?”^৪ এমনকি তৃতীয় পরিচ্ছেদে তার ভালোবাসার আরও মূর্তরূপ পরিগ্রহ করে বিরাজের স্বামীর করুণ স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে নিজের মৃত্যুকে যাচতে স্বামীকে উপায় বাংলাতে বলে — “... কি খেলে মরণ হয় বলে দিতে পার ?... হয় বলে দাও, না হয় আমাকে খুলে বল, কেন এমন রোজ রোজ শুকিয়ে যাচ্ছ।”^৫ আসলে একমাত্র বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে সাধ্যাতীত ব্যয়ের জন্য ধার করায় তাদের সুখের দাম্পত্য দাঁড়িয়ে পড়ে

বালির বাঁধের উপর। একের পর এক স্বামীর অপমান সে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু স্বামী তার ঋণ মুক্তির প্রস্তাবে তেমন একটা সাড়া দেয় না। ক্রমে তাদের অল্প-মধুর দাম্পত্যে শীতলতা দেখা দেয়। যার অনিবার্য পরিণাম এক দূরতিক্রম্য দূরত্ব। টলতে থাকে বিরাজের যাবতীয় বিশ্বাস সংস্কার। বিরাজ একদা স্বামীর পা ছুঁয়ে জীবনের শেষ দিনের বিদায়ের ভাবনা ভেবেছে। সেই স্বামীর প্রতি অচলাভক্তি ধরে রাখতে পারেনি। একাদশ পরিচ্ছেদে নেশা করে দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি গোপাল চক্রবর্তীর মৃতদেহ সংকার করে ফিরে নীলান্বরের অসুস্থ ছর-তপ্ত স্ত্রী বিরাজের অভিমান-অভিযোগে বিন্দুমাত্র পাত্তা দেয়নি। পরন্তু তাঁর চরিত্র নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করতে ছাড়েনি। সেই নেশার ঝোঁকে মনের অবচেতনে ঘুরপাক খাওয়া বিরাজের সম্বন্ধে লালিত সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয় অকৃতজ্ঞ বিবেকহীন নীলান্বর —

“নীলান্বর বলিল, কার চোখে ধুলো দিতে চাস বিরাজ ? আমার ? আমি অতি মূর্খ, তাই সেদিন পীতাম্বরের কোন কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সে ছোটভাই, যথার্থ ভায়ের কাজই করেছিল। নইলে কেন তুই বলতে পারিসনে কোথা ছিলি ? কেন মিছে কথা বললি — তুই ঘাটে ছিলি ?”

নীলান্বরের আচরণ শুধু স্ত্রীর চরিত্রে কালিমা লেপনেই ক্ষান্ত হয়নি। তার বাস্তব পরিণতি বা অভিঘাতে এই পরিচ্ছেদেই নীলান্বর হাতের কাছে পাওয়া পানের শূন্য ডিবাটা বিরাজের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়। বিরাজ রক্তান্ত হয়। শরীরের আঘাত থেকে বড় হয়ে ওঠে মর্মপিড়া। সে মেনে নিতে পারে না স্বামীর এইরূপ নির্বিবেচকের মতো ব্যবহার। তবু নেশায় মত্ত স্বামীর হুঁশ ফেরে না। সে আরো ঝাঁঝালো বাক্যবাণের খোঁচায় স্ত্রীর সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেয় —

“...না, মারিনি। কিন্তু দূর হ সুমুখ থেকে — ও মুখ আর দেখাস নে— অলক্ষী, দূর হয়ে যা!”

তবে বিরাজও আর কোন অপেক্ষা করল না। নীলান্বরের এহেন কটুবাক্যে তার নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করলো। তার মুখ ফুটে বেড়িয়ে এল অত্যাচারিতের মনের নিদারুণ ভাবনা —

“...এই এক বছর যাই-যাই করছি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারিনি। চেয়ে দেখ, দেহে আমার কিছু নেই, চোখে ভাল দেখতে পাইনে, এক পা চলতে পারিনে আমি। যেতুম না, কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপাবদ আমাকে দিলে, আর আমি তোমায় মুখ দেখাব না।”^৮

বিরাজ নিজে আত্মঘাতী হবার সংকল্প নিয়ে সরস্বতীর জলে ঝাঁপ দিতে গিয়ে হঠাৎ-ই তার জেদ চেপে গেল। সে যা কখনও ভাবতে পারেনি তাই করল। সে তার বাড়ির পরিচারিকা সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করল। এই চাকরানী সুন্দরীকেই তার বাড়ি থেকে সে কাজ ছাড়িয়ে দিয়েছিল চরিত্রহীনতার জন্য। ঘটনার বাস্তব অভিঘাতে বিরাজকে বাধ্য করা হল জমিদার পুত্রের আদিম প্রবৃত্তির কাছে ধরা দিতে। একদা এই জমিদার পুত্রের স্নানের পুকুর ঘাটে লম্পটের মত নারীশরীর ভোগের দৃষ্টি সে মেনে নিতে না পেরে প্রতিবাদ করেছিল। আর সেই পাপ ভয়ে ভীত, স্বামীর মঙ্গলের ভাবনায় সদা তটস্থ বিরাজই কিনা নিজের অসতীত্ব অপবাদকে মেনে নিতে না পেরে চৌদ্দ পরিচ্ছেদে বলেছে — “... সাধু পুরুষ আমার হাতের জল পর্যন্ত খাবেন না, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবে ত! বেশ!”^৯

স্বামীর কাছে গায়ে হাত তোলা সতীত্ব নিয়ে কটু কথা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তার অপূরণীয় কামনা-বাসনার আদিম রিপু এর পর কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে নি। আর এতদিনে সমস্ত চর্চিত যাবতীয় সংস্কারের মুন্ডপাত ঘটিয়ে বিরাজ যেন নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অপবাদকেই প্রমাণ করে নিজের জীবনের মধ্যে তার সমুচিত জবাব দিতে চেয়েছে।

বিরাজ এই চৌদ্দ পরিচ্ছেদেই জমিদারের সুশ্রী বজরায় সওয়ার হয়েছে। জমিদার পুত্র নেশায় উন্মত্ত চরিত্রহীন রাজেন্দ্রের সামনে বসে বিরাজের মনের অবস্থাকে শিল্পী শরৎচন্দ্র বেশ সুন্দরভাবে এঁকেছেন। দ্যোতনা দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক ভাবে বিবর্তিত নতুন বিরাজের সতী ধর্ম, ন্যায়নীতি আদর্শের দুর্বার প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের দিক কে তুলে ধরে—

“তাহার এত কাছে পরপুরুষ বসিয়া, অথচ মুখে তাহার আবরণ নাই। মাথায় এতটুকু আঁচল পর্যন্তও নাই। এই সময়ে বজরা ঘন ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের মধ্যে ঢুকিতেই

দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া হাত দিয়া ডালপালা সরাইতে ব্যস্ত হইল। নদী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ভাঁটার টানও এখানে অত্যন্ত প্রখর। ওরে সাবধান বলিয়া রাজেন্দ্র দাঁড়ীদের সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিরাজের উদ্দেশ্যে — লাগবে, — ভিতরে আসুন— বলিয়া নিজে গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল। বিরাজ মোহাচ্ছন্ন, যন্ত্রচালিতের মত পিছনে আসিয়া ভিতরে পা দিয়াই অকস্মাৎ ‘মাগো’ বলিয়া চৈচাইয়া উঠিল।”^{১০} শেষ পর্যন্ত নিজের কৃতকর্মের পর হঠাৎ সন্নিহিত ফিরে পেয়ে অতল জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জয়ী হয়েছে তার মধ্যে চলা সতীত্বের আজন্মালালিত সংস্কার। সে কোন মতেই মেনে নিতে পারেনি ক্ষণিকের আবেগের বা জেদের বশে করে বসা ভুলকে। তার সংস্কার-বিশ্বাস আর পাপবোধ তাকে শেষ পর্যন্ত আদি রিপু চরিতার্থ করার সুযোগকে গ্রহণ করে নি। শরৎচন্দ্র বিরাজকে দাম্পত্যজীবনের আশাভঙ্গের বেদনার থেকে তৃতীয় পক্ষের দিকে ঝাঁকার একটি সংকেত দিয়েছেন মাত্র। সম্ভবনাকে জিইয়ে রেখেও রক্ষণশীল শরৎচন্দ্রকে জয়ী করেছেন সেই চিরন্তন পারিবারিক নীতি ও আদর্শকেই। তিনি পরিস্থিতির পুরো সুযোগ-সম্ভাবনাকে কাজে লাগালে এই রচনার পরিণতি কি হতে পারতো তার একটা ইঙ্গিত আমরা পেয়ে যাই।

চরিত্রহীনঃ

শরৎচন্দ্রের বিতর্কিত উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘চরিত্রহীন’ (১৯১৭) অন্যতম। সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম এবং নারীর অবদমিত প্রেমাকাজক্ষার বেআব্রু প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসটিতে। বিবাহিত নারীর দুর্বীর অপ্রতিরোধ্য প্রেম ও পর-পুরুষের সঙ্গে দেহ-মিলনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সেকালে আলোচক, সমালোচক এবং পণ্ডিত মহলে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। উপন্যাসটিতে পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা নারী চরিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্রের সমধিক আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। সাবিত্রী ও কিরণময়ী-চরিত্র দুটির মধ্যে দিয়ে উপন্যাসিক যৌন জীবনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও সৃজনমুখী আদিম প্রবৃত্তির দিকটিকেই রূপায়িত করেছেন। মানব মনের অন্তর্গত প্রদেশের সুপ্ত যৌনতাবোধ (Sexuality) যাকে যৌন মানস শক্তি বা ‘Psychic energy’ বলে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য অবদমিত হয়ে মনের নিঃসর্গনস্তরে আশ্রয় নিলেও তা বিলুপ্ত

হয় না। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ছদ্ম রূপের আশ্রয়ে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা চেতন স্তরে এসে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

শরৎ সাহিত্যের জটিল-মনস্তাত্ত্বিক চরত্রগুলির মধ্যে কিরণময়ী অন্যতম। স্বামী হারাণপন্ডিতের রুগ্নতা এবং জ্ঞানতন্ময়তার কিরণময়ীর ক্ষুধিত যৌবনের পিপাসা অতৃপ্তই থেকে যায়। কিরণময়ীর রূপ সৌন্দর্য অনঙ্গ ডাক্তারকে মুগ্ধ করেছিল। অনঙ্গ ডাক্তারের লালসার শিকার হয়েছিল কিরণময়ী — আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টির মধ্যে কোনো জটিলতা নেই কেননা বিনা পয়সায় স্বামীর চিকিৎসা করিয়ে নেওয়ার বিষয়ে তার শাশুড়ীর ও প্রশ্নই ছিল। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে দেখা যায় বিনা পয়সায় স্বামীর চিকিৎসার বিষয়টি উপলক্ষ্য মাত্র। মূল লক্ষ্য অনেক বছরের ‘দুর্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালায় তার আদিম প্রবৃত্তি (Id) অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে বেরিয়ে এসে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খুঁজতে চেয়েছে।

সে বিবাহিত তাই তার ইগো বা অহংবোধ অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে অবাধ অসামাজিক প্রেমে ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তারকে প্রশ্নের বিষয়টি তার অহংবোধ বা ইগো (ego) মেনে নিয়েছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর কিরণময়ীর প্রেম-প্রবৃত্তি উপেন্দ্রকে কেন্দ্র করে তৃপ্ত হতে চেয়েছে। কিন্তু উপেন্দ্রে কিরণময়ীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে। তার ঐ প্রত্যাখ্যানে কিরণময়ীর প্রবৃত্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন কিরণময়ীর অসাধারণ শক্তি, দৃপ্ত তেজস্বিতা। তার শক্তি ও তেজের প্রকাশ দেখা যায় যখন উপেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনঙ্গ ডাক্তারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের সমস্ত গয়না ডাক্তারের পায়ে উজাড় করে দিয়েছিল।

স্বামীকে হারানোর পর কিরণময়ীকে বিকারগ্রস্ত হতে দেখা যায় যখন উপেন্দ্র তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে। উপেন্দ্রের মৃত্যুর আঘাত তাকে উন্মাদিনী করে তোলে। কিরণময়ীর বিকারের চিত্র শরৎচন্দ্র নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিরণময়ীর অসঙ্গত উক্তি আচরণের মূল নির্জ্ঞান মনের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। উপেন্দ্রের স্ত্রী সুরবালার

সুখী দাম্পত্যের চিত্র তার মনে ঈর্ষাবোধকে জাগ্রত করেছিল। এর সঙ্গে উপেন্দ্রের উপেক্ষা তার মনে প্রতিহিংসার সৃষ্টি করে। তেত্রিশ পরিচ্ছেদে শাশুড়ী অঘোরময়ীর মিথ্যা অভিযোগে কিরণময়ীর আত্মপক্ষ-সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে উপেন্দ্র তাকে ‘নাস্তিক’, অপবিত্র, ভাইপার বলে নিন্দা করে চলে গেলে সে মর্ম-যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়, মানসিক ভারসাম্য হারায়। কিরণময়ীর মনোব্যাধি এবং জটিল মানসিকতার জন্য পরিবেশের একটা বড় ভূমিকা ছিল। ফ্রয়োডোত্তর মনোবিজ্ঞানী পাভলভের মতে মানুষের মানসিকতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কিরণময়ীর স্বামীর কাছ থেকে বিবাহিত জীবনে শুধু বঞ্চনাই পেয়েছে। শাশুড়ীও পুত্রবধূর প্রতি একপ্রকার উদাসীন ছিল। অসুখী গৃহপরিবেশ তার আবেগ অনুভূতি নিরুদ্ধ হওয়ায় বিকারের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

শরৎচন্দ্রের যে উপন্যাসগুলি অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়বাহী ‘গৃহদাহ’ তাদের মধ্যে অন্যতম। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৩২৩ সালের মাঘ-চৈত্র, ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩২৫ সালের পৌষ-চৈত্র এবং ১৩২৬ সালের আষাঢ়-মাঘ সংখ্যা ‘ভারতবর্ষ’ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।” (৪র্থ পৃ. ৬০১) শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে নারী মনের প্রেম-বাসনা, তার ত্যাগ-তিতিক্ষা, নিষিদ্ধ প্রেমের দিকটি চিত্রিত হয়েছে। ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসে এসব কিছুর পরিচয় তো আছেই অধিকন্তু আছে নারীর গহন মনের গভীরতার পরিচয় যা শরৎচন্দ্রের অন্য উপন্যাসে বিশেষ দেখা যায় না। এখানে পরস্পর বিপরীতধর্মী দু’জন পুরুষের দোটানায় পড়ে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অচলার দাম্পত্যে যে সমস্যা-সংকটের সৃষ্টি হয়েছে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপন্যাসিক তার স্বরূপ উদ্ঘাটন- করেছেন। বিবাহিত রমণীর জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির বা বিবাহিত নারীর উপস্থিতির ফলে দাম্পত্য-সমস্যার সৃষ্টি বা বিবাহিত নারীর অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি — নতুন কোন বিষয় নয়। কিন্তু ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসে অচলার অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তির দিকটিই শুধু প্রকাশিত হয় নি, অন্য পুরুষকে নিয়ে সারাজীবন চলার বাসনার দিকটিও তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দু’জন পুরুষকে নিয়ে সারা জীবন চলার বাসনাই তার চরিত্রটিকে স্বাভাবিক দান করেছে।

মহিম ও সুরেশ — এই দুই বন্ধুর প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণে অচলার মনোলোকে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে ঔপন্যাসিক তা মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার আলোকে চিত্রিত করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন— ‘গৃহদাহ’ শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম — মহৎ-চিহ্নে অনচ্ছাকৃত পাপের প্রতিক্রিয়া যে কি ভয়ানক তাহা ইহাতে সুনিপুণ বিশ্লেষণের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।”^{১১}

রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসের রচনা শুরু হয়। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে বিমলার দাম্পত্য জীবনে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল সন্দীপের আবির্ভাবের পর। দাম্পত্য জীবনের প্রবেশের পূর্বেই অচলার জীবনে সুরেশ এসে উপস্থিত হয়েছে। বিবাহের পূর্বেই শুরু হয়েছে তার হৃদয়-যুদ্ধ — “যে দুই বন্ধু আজ অকস্মাৎ তাহার জীবনের এই সন্ধিক্ষেত্রে এমন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের একজনকে যে আজ ‘যাও’ বলিয়া বিদায় দিতেই হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ; কিন্তু কাহাকে ? কে সে ?”^{১২}

উপন্যাসে দেখা যায় অচলা দুই বন্ধুর মধ্যে মহিম-কেই স্বামী হিসেবে নির্বাচিত করে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ব্রাহ্ম পরিবারের শিক্ষিতা অচলা স্বাধীন-নির্বাচনের মাধ্যমে মহিমকে বেছে নিলেও সুরেশের প্রতি প্রবল আকর্ষণ তাকে দাম্পত্য-জীবনে স্থিতি দেয়নি। স্থিতি হয়তো তার কাম্যও ছিল না; নইলে একের আশ্রয়ে থেকে অন্যের জন্যে মন কেমন-কেমন করতো না। যে ইচ্ছা কোন কোন নারীর জীবনে সত্য, অথচ তা সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে প্রকাশের সুযোগ বা সাহস দেখাতে পারে না, সেই সুযোগ ও সামর্থ্য তৈরী করে নিয়েছে ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসের অচলা তার একক প্রয়াসে। অচলার জীবন সমস্যা রূপায়ণে শরৎচন্দ্র যে শৈল্পিক নৈপুণ্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে সে প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— “গৃহদাহ উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের শিল্পনৈপুণ্য চরমে উপনীত। ভাবালুতা, অতিকথন, ভাষাগত শৈথিল্য ও মুদ্রাদোষ এখানে অনুপস্থিত। প্লটের বাঁধুনি ও সংঘম

যুক্ত হয়েছে বক্তব্যের ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে। কয়েকটি দৃশ্য সুনির্বাচিত। প্রায় একই ধরনের দৃশ্য পরবর্ত্তরে নতুন তাৎপর্য অধিত হয়ে দেখা দিয়েছে।”^{১৩}

চুয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত উপন্যাসটির ঘটনা-সংঘটন ও চরিত্র-পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্বামী মহিমের প্রতি অচলার ভালোবাসা ছিল গভীর ও আন্তরিক। অচলা ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে হলেও তার মনের গভীরে একটা সতীত্বের সংস্কার ছিল। কাহিনির মধ্যে তার এমন সব উক্তি, সংলাপ আছে যাতে স্বামীপ প্রতি তার শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদের শেষে মহিমের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে অচলা বলেছিল —“তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করার জন্য রেখে গেলে? যে তোমার ওপর এত বড় কৃতজ্ঞতা করতে পারলে, তার হাতে আমাকে ফেলে যাচ্ছে কি বলে? ...আমার লজ্জা করবার আর সময় নেই। দেখি তোমার ডান হাতটি। বলিয়া নিজেই মহিমের দক্ষিণহস্ত টানিয়া লইয়া নিজের আঙ্গুল হইতে সোনার আংটিটি খুলিয়া তাহার আঙ্গুলে পরাইয়া দিতে দিতে কহিল, আমি আর ভাবতে পারি নে। এইবার যা করবার তুমি করো। বলিয়া গড় হইয়া পায়ের কাছে একটা নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।”^{১৪}

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে শুভদৃষ্টির সময় মহিমের পদতলে মাথা রেখে মনে মনে বলেছিল —“ প্রভু, আর আমি ভয় করি নে। তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, সেই আমার স্বর্গ; আজ থেকে চিরদিন তোমার কুটীরেই আমার রাজপ্রসাদ।”^{১৫} এই অচলা বিবাহের কিছুদিন পরেই স্বামীর সামনেই স্বামীর বন্ধু সুরেশকে বলেছে—“সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও— যাকে ভালবাসি নে, তার ঘর-করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না।”^{১৬}

অচলা-মহিমের অসুখী দাম্পত্যের মূলে যে অচলা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ক্রিয়াশীল ছিল, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে শুধু অচলা নয়, মহিম, সুরেশ

— এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও দাম্পত্য-সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট প্রধান নারী চরিত্রগুলির মধ্যে মাতৃরূপের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অচলা প্রিয়া হিসেবে, নারী হিসেবে তার আকাজক্ষার পূর্ণতা চেয়েছে। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, স্তিতপ্রজ্ঞ, স্বল্পভাষী মহিমের সঙ্গে অচলার আলাপ হয় মহিমের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সংযোগ থাকার সুবাদে। অচলার পিতা কেদার মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ-ভূক্ত হলেও তার মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। হিন্দু সমাজের শিক্ষিত মহিমকে তিনি পছন্দ করতেন। মহিমের গ্রামের বাড়িতে কিছু জমি জায়গা অর্থাৎ অনবস্তুর সংস্থান থাকায় তার হাতে তিনি কন্যা সম্প্রদান করাকে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করেছিলেন। পারম্পরিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে অচলা ও মহিমের প্রেমের সম্পর্ক তৈরী হয়। তাদের বিবাহ ও একপ্রকার ঠিক হয়ে যায়।

মহিমের বন্ধু সুরেশ। সুরেশ মহিমের একেবারে বিপরীত প্রকৃতির। অত্যন্ত আবেগ প্রবণতা ও প্রবৃত্তির অসংযম তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে নাস্তিক ও ঘোরতর ব্রাহ্ম বিদ্বেষী। মহিমের সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সে দু'দুবার তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তার প্রিয় বন্ধু ব্রাহ্ম মেয়ের মোহে ধর্ম বিসর্জন দিতে চলেছে জেনে সে খুব উত্তেজিত হয়ে বন্ধুকে ব্রাহ্ম মেয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কেদার বাবুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কেদারবাবুর বাড়িতে অচলাকে দেখার পর সুরেশের আদিম প্রবৃত্তি (Id) দুর্বল হয়ে ওঠে। সে তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। আবেগের উদ্দামতায় সে হিতহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। বৈষয়িক বুদ্ধিসর্বস্ব, সংকীর্ণচিত্ত কেদার বাবুর কাছে সে মহিমের দারিদ্র্যের কথা জানিয়ে তাদের বিবাহ ভঙ্গ করতে প্রয়াসী হয়। এরপর দেখা যায়, কেদারবাবু সুরেশের অগাধ ঐশ্বর্যের কথা জানতে পেরে তার হাতেই মেয়েকে সম্প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগী হন। সুরেশ অচলাকে পাবার জন্য অর্থলিপ্সু কেদারবাবুকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। অচলা ঋণগ্রস্ত পিতার অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে মহিমের পরিবর্তে সুরেশকে স্বামী হিসেবে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। সুরেশ অচলার মেলা মেশার পর্বে অবশ্য বেশ কিছুদিন অচলার সঙ্গে মহিমের সাক্ষাৎ ঘটে নি। মহিম

তার আত্মপরায়ণ মানসিকতার জন্য অচলাকে কোন খবর না দিয়েই গ্রামের বাড়ীতে চলে গিয়েছিল। মহিমের আবেগহীন নিরুত্তাপ ব্যবহার ও ঔদাসীন্যে অচলার মনের গভীরে তার প্রতি এক ধরনের ক্ষোভ ছিল। মহিমের আত্মসংবৃত স্বভাবের তুলনায় সুরেশের দ্বিধাসংকোচহীন উদ্দাম আবেগ তার নির্জ্ঞান মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করায় তার মন সুরেশের গলায় বরমাল্য দিতে চায়। সে বুঝতে পারে নি যে, ঐ মোহ দুর্বলতাকত ক্ষণস্থায়ী। তাই দেশের বাড়ি থেকে মহিম তার সামনে এসে দাঁড়ালে তার মনে সুরেশের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা জাগে। অচলাকে লাভের জন্য সুরেশের সক্রিয়তাকে তার নিষ্ঠুর উৎপীড়ন বলে মনে হয়।

মহিম ও অচলার পারস্পরিক আকর্ষণের মূলে ছিল কৃষ্টিগত সাম্য। তাই সে মহিমকে অনুরোধ করেছিল তার রাক্ষস বন্ধুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। মহিমের উপস্থিতির পর মহিমের প্রতি অচলার আবেগ ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে সুরেশের নির্জ্ঞান ইচ্ছা বেআবু ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সে আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তিতে ক্ষোভে, দুঃখে উন্মত্ত হয়ে কেদারবাবু ও অচলাকে ভীষণভাবে অপমান করে উধাও হয়ে যায়। এরপর কেদারবাবু মহিমের সঙ্গেই অচলার বিবাহ দিতে বাধ্য হন। বিবাহের পর কলকাতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ ছেড়ে অচলা মহিমের সঙ্গে তাদের গ্রামের বাড়িতে যায়। গ্রামের মাটির বাড়ি, আত্মীয় স্বজনহীন নিরানন্দময় পরিবেশ, তার সম্পর্কে গ্রাম্য-সমাজের মানুষের বিরূপ মন্তব্য তার মনকে নৈরাশ্য ও অবসাদে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই সময়ে তাদের সংসারে মহিমের দূর সম্পর্কের এক বোন মৃণাল তার স্বামী সহ এসে উপস্থিত হয়। মৃণালের প্রাণোচ্ছল ব্যবহারে নিরানন্দময় পরিবেশে বৈচিত্র্য আসলেও তার গ্রাম্য পরিহাস রসিকতা অচলার মার্জিত রুচিতে আঘাত করে। তাছাড়া, মৃণালের সঙ্গে একসময় মহিমের বিবাহের সম্ভবনা তৈরি হয়েছিল জেনে এক ধরনের ঈর্ষাবোধ তার মনে জেগে ওঠে। এরপর অচলার হাতের রান্না মৃণাল খেতে না চাইলে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহিমের নিরুত্তাপ আচরণে অচলা ক্ষোভে দুঃখে অস্থির হয়ে ওঠে। ‘চোখের বালি’ (১৯০৩খ্রি.), ‘ঘরে-বাইরে’ (১৯১৬ খ্রি.) প্রভৃতি উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যা সৃষ্টির পূর্বকার সুখী-দাম্পত্য জীবনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু

‘গৃহদাহ’ উপন্যাসে মহিম-অচলার দাম্পত্য জীবনের পরিচয় না থাকলেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নির্ভরতার পরিচয় যথেষ্ট আছে।

মৃণালকে কেন্দ্র করে মহিমের প্রতি অচলার অভিমান ও ক্ষোভ যখন চরম সীমা স্পর্শ করে ঠিক সেই সময়ে উদ্ভূত দাম্পত্যের মাঝে অশুভ গ্রহের মতো সুরেশের আবির্ভাব ঘটে। সুরেশ আবির্ভূত হলে প্রথম দিকে দেখা যায়, অচলার প্রবৃত্তি বা অদস্ (Id) সংযতই ছিল, মহিমের প্রতি তার নির্ভরতাও যে কিছুমাত্র কমে নি, তার পরিচয় রয়েছে অচলাকে আবেগ প্রবণ সুরেশের কাছে রেখে সন্ধ্যাবেলায় মহিম জমিদারের ছেলেকে পড়াতে যেতে চাইলে অচলার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে —“ এই সন্ধ্যায় তাহারই সহিত তাকে একাকী ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাবে সে মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; কিন্তু বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া কহিল, বাঃ, সে কি হয়? অতিথিকে একেলা ফেলে — মহিম, তাতে অতিথি সৎকারের কোন ক্রটি হবে না। তা ছাড়া তুমি ত করলে — অচলা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু আমিও থাকতে পারব না।”^{১৭}

এরপর কাহিনী অন্য দিকে বাঁক পরিবর্তন করে। আবেগহীন, আত্মকেন্দ্রিক মহিমের নিস্পৃহতার বিপরীতে সুরেশের আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয়ে অচলার চিত্ত চাক্ষু্য দেখা দেয়। তার বাবার অসুস্থতার বিষয়ে সুরেশ-মহিমের কিছু কথোপকথন সে আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছিল। মহিম সে বিষয়ে তাকে কিছু না জানালে তার ক্ষোভ তীব্রতর হয়ে ওঠে। স্বামীর উপস্থিতিতেই সে সুরেশের কাছে স্বামীগৃহ ছেড়ে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। অচলা-মহিমের দাম্পত্যের তীব্র সংকটমুহূর্তে তারা গৃহহীন হয়ে পড়ে—অন্ধকার রাত্রে তাদের গৃহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অচলার শাড়ী ও গয়নার বাস্তু উদ্ধার করতে গিয়ে মহিম গুরুতর আহত হয়। অচলাকে মহিম সুরেশের সঙ্গে কেদারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার পর নিজে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ মহিমকে সুরেশ তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে। অসুস্থ মহিমের সেবা করার জন্য মৃণাল আসে সুরেশের বাড়িতে। এর-পর অচলা সেখানে মৃণালের কাছ থেকে স্বামীর সেবা শুশ্রূষার ভার নেয়। মহিমের এই অসুস্থতার সময়েরই

আবার মহিম ও সুরেশকে কেন্দ্র করে অচলার চেতন-অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। যে বাসনাকে সে তার বিবেক বুদ্ধির দ্বারা অবদমিত করেছিল সেই বাসনাই আকস্মিক ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে অসুস্থ মহিমের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য জব্বলপুরে চেঞ্জ যাবার দিন। সুরেশের শুষ্ক মুখ, উদ্ভ্রান্ত চেহারা লক্ষ্য করে উদ্ভিগ্ন অচলা ভীষণ আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে, তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। চোখের জল মুছে হঠাৎ সুরেশকে বলে —“তোমার কখখনো শরীর ভাল নেই সুরেশবাবু, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।”^{১৮}

সুরেশকে তাদের সঙ্গে চেঞ্জ যাবার আমন্ত্রণ-ই অচলার দাম্পত্যে ট্র্যাজিক পরিণতির প্রতীক। সুরেশ তাদের সঙ্গে না গেলে হয়ত তারা নতুন করে সুখী-দাম্পত্যের পত্তন করতে পারত। তার ইঙ্গিতে রয়েছে উপন্যাসের ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে অচলার প্রতি মহিমের নির্ভরশীলতা ও তার প্রতিক্রিয়ায় অচলার হৃদয়বৃত্তির উদ্বোধনের মধ্যে— “মহিম কহিল, তোমরা সকলে আমাকে যতটা সুস্থ সবল ভাবছ, ততটা এখনো আমি হইনি। কোনদিন হব কিনা, তার আমি আশা করিনে।

অচলা বলিল, সেই জন্যই ত ডাক্তার তোমার চেঞ্জের ব্যবস্থা করেছেন। একবার ঘুরে এলেই সমস্ত সেরে যাবে।

মহিম ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, কি জানি। কিন্তু এ অবস্থায় আমার নিজের বা পরের উপর নির্ভর করে স্বর্গ যেতেও ভরসা পায় না। অচলা, ভেতরে ভেতরে আমি বড় দুর্বল, বড় অসুস্থ। তুমি কাছে না থাকলে হয়ত আমি বেশী দিন বাঁচবো না। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর যেন সজল হইয়া উঠিল।

যে মুখ ফুটিয়া কখনো কিছু চাহে না, কখনো নিজের দুঃখ অভাব ব্যক্ত করে না, তাহারই মুখের এই আকুল ভিক্ষা ঠিক যেন শূলের মত আঘাত করিয়া অচলার হৃদয়ে যত স্নেহ, যত করুণা, যত মাধুর্য এতদিন রুদ্ধ হইয়া ছিল, সমস্ত একসঙ্গে একমুহূর্তে মুখ খুলিয়া দিল। সে নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া পাছে অসম্ভব কিছু-একটা করিয়া বসে এই ভয়ে চক্ষের জল চাপিতে চাপিতে একেবারে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।”^{১৯}

সুরেশের চেঞ্জের যাবার বিষয়ে মহিম সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল। হঠাৎ হাওড়া স্টেশনে প্রকান্ড একটা ব্যাগ হাতে করে সুরেশ উপস্থিত হলে অচলার পিতা কেদারবাবু শুধু বিস্মিতই হন নি, প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কেদারবাবু —“চিংকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি সুরেশ? তুমি কোথায় চলেছ?

জবাবটা সুরেশ অচলাকে দিল। তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, নাঃ — তোমার উপদেশ, নিমন্ত্রণ কোনটাই অবহেলা করা চলে না দেখলুম। আজ সকালবেলা তুমি অমন করে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে হয়ত ধরতেই পারতুম না, শরীর আমার কত খারাপ হয়ে গেছে! চল, তোমাদের অতিথি হয়েই দিন-কতক দেখি, সারতে পারি কি না! বাস্তবিক বলছি ম —

বেশ ত, বেশ ত সুরেশ। তা ছাড়া, নূতন জায়গায় আমাদেরও ঢের সাহায্য হবে; বলিয়া মহিম পলকের জন্য একবার অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সেই মুহূর্তের নিঃশব্দ ব্যথিত দৃষ্টি যেন সকলকেই উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়া অচলাকে কহিয়া উঠিল, আমাকে বলিলে না কেন? যাহার স্বাস্থ্য লইয়া মনে মনে এত উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছে, আজ সকালবেলা পর্যন্ত উভয়ে যে কথা আলোচনা করিয়াছ, আমাকে তাহা ঘুণাগ্রে জানিতে দাও নাই কেন? এই লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল, অচলা!”^{২০}

— এই ঘটনা শান্ত, স্বপ্নভাষী অসুস্থ মহিমের হৃদয়ে তীব্র বেদনার সঞ্চার করে। অচলার প্রতি তার বিশ্বাসের মর্মমূলে তীব্র-আঘাত হেনে তার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে, মুখে যতই ‘বেশত, বেশত সুরেশ’ বলুক না কেন। এরপর দেখা যায়, যাত্রা পথে সুরেশ দুর্যোগময় রাত্রির অন্ধকারে অচলাকে ভুল বুঝিয়ে তার স্বামীর কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এলাহাবাদে নামার পরিবর্তে মোগলসরাইয়ে নেমে সে অচলাকে নিয়ে অন্য ট্রেনে উঠে পড়ে। অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় সে রুগ্ন ও অসহায় বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। অচলা বুঝতে পারে, সে সর্বনাশের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তবুও সে মহিমের প্রতি তার গভীর ভালবাসা ও সতীত্বের সংস্কারের জন্য সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় নি।

ডিহরীতে এক পাছশালায় সুরেশ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ঘটনাধারা অন্যথাতে বইতে শুরু করে। তারা আশ্রয় পায় রামবাবুর বাড়িতে। পরিচিত হয় স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয়ে। রামবাবুর বাড়িতে অবস্থানকালে সুরেশ সম্পর্কে অচলার মনের অনুভবের বিবরণে তার মর্মযন্ত্রণার দিকটিই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে — “এই জনহীন পুরীর মধ্যে কেবলমাত্র সুরেশকে লইয়া জীবনযাপন করিতে হইবে এবং সেই দুর্দিন প্রতি মুহূর্তে আসন্ন হইয়া আসিতেছে। বাধা নাই, ব্যবধান নাই, লজ্জা নাই — আজ নয় কাল বলিয়া একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিবার পর্যন্ত সুযোগ মিলিবে না।”^{২১}

সুরেশের অসুস্থতার পর থেকে অচলার একটু একটু করে মানস-পরিবর্তন ঘটে। সে ভাবে মহিমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর সুরেশ তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। সুরেশ ডিহরীতে বাড়ি কিনতে চাইলে তাই অচলা সম্মতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য তার সামনে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। অসুস্থ মহিমকে ত্যাগ করে আসার পর এক ধরনের অপরাধবোধ তার মনে জাগ্রত হয়। এই অপরাধবোধ ও লোকলজ্জার ভয় তাকে তাড়না করায় সে স্বামীর কাছে বা পিতৃগৃহে ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারে না।

অচলা তাই সুরেশের নতুন ক্রীত বাড়িতে গিয়ে ওঠে। এই বাড়িতেই এক ঝড়-জলের রাতে রামবাবুর অনুরোধে অচলা সুরেশের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, প্রতারণার দ্বারাই অচলা বৃদ্ধ রামবাবুর স্নেহ-ভালবাসা লাভ করেছিল, তা থেকে বঞ্চিত হবার ভয়েই সে সুরেশের ঘরে গিয়ে রাত্রিযাপন করে। সুরেশের প্রবৃত্তি দুর্বীর। সংযম শব্দটি তার অভিধানে নেই। সে তার অতৃপ্ত প্রেমাকাজক্ষা চরিতার্থ করতে চেয়েছে অচলাকে কাছে পেয়ে। তাই সুরেশের শয্যায় অচলাকে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছে।

সুরেশের শয্যায় সতীত্ব বিসর্জন দেওয়ার পর সীমাহীন গ্লানিবোধে অচলার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়। সতীত্ব বা স্বামী-সংস্কার অচলার হৃদয়ের গভীরে নিহিত ছিল। তাই

সাময়িক বিভ্রান্তি বা উত্তেজনার বশে স্বামী সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে সে যত গুরুতর অপরাধ করুক না কেন, কখনোই নারীত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিসর্জন দিতে চায় নি। তাই তার অপরাধ বোধ মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। সুরেশের শয্যা রাত কাটানোর পরদিন প্রভাতে অচলার চোখে-মুখে রামবাবু অচলার দুঃখ-যন্ত্রনার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছে — “তাহার মুখ মড়ার মত সাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরনার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।”^{২২}

এরপর অচলার কাছে জীবন অর্থহীন বলে মনে হয়। তার নিষ্পন্দ অর্থহীন জীবন সুরেশের কাছে বোঝা বলে মনে হয়। আবেগপ্রবণ সুরেশ তাই অচলার সাহচর্য পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার বিষয়ে প্রায় মনঃস্থির করে ফেলে। এই সময় হঠাৎ-ই রামবাবুর বাড়িতে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে মহিমের। মহিমকে দেখে অচলা মূর্ছিত হয়। অচলার মূর্ছা সুরেশকে তার সিদ্ধান্তের বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় করেছে। সুরেশের পরিকল্পনা আন্দাজ করেই অচলা তাকে প্রশ্ন করেছে — “তুমি কি আমাকে ফেলে চলে যাবে?” সুরেশ এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তর না দিলে অচলা তাকে আবার জিজ্ঞাসা করে “...আর কি তুমি আমাকে ভালবাস না?” উত্তরে সুরেশ বলেছে — “... এ প্রশ্নের জবাব তেমন নিঃশংসয়ে দিতে পারি নে অচলা, মনে হয় সে যাই হোক, একথা সত্য যে, এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াবার আর আমার শক্তি নেই।”^{২৩} একাকীত্ব, মহাশূন্যতা অচলাকে গ্রাস করে। তার জীবনবৃত্তে মহিম অনুপস্থিত — তাকে সে ছেড়ে এসেছে; সুরেশ নেই সে তাকে ছেড়ে গেছে। সুরেশের মৃত্যুর পর অসহায় অচলার একাকিত্ব তথা শূন্যতার চেহারাটি শরৎচন্দ্রের মর্মস্পর্শী বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। — “সেখানে ভয় নাই, ভাবনা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই — যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার রঙ নাই, মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই — একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য।”^{২৪}

অচলা প্রথমে মহিমকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু মহিমের আবেগহীন নিরুদ্ভাপ ভালোবাসায় তার প্রেমাকাজক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নি। তাই মহিমের বন্ধু, মহিমের ঠিক বিপরীত স্বভাবের সুরেশের দুর্বীর আবেগ ও প্রাণোচ্ছলতা তাকে তীব্র ভাবে আকর্ষণ করে। তার অবচেতন মনে সুরেশের প্রতিও ভালবাসা জাগ্রত হয়। কিন্তু তার এই ভালোবাসা সমাজ স্বীকৃত নয় বলে মনের সচেতন স্তরে তাকে তুলে আনতে পারে নি। সুরেশের সঙ্গে ডিহরীবাস কালে তাই সে স্বামী মহিমকে ছেড়ে আসার জন্য তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

সুরেশের মৃত্যুর পর স্বামী মহিমের হাত ধরে অচলাকে বলতে শোনা যায় —“আমি আর দুর্বল নয়, তোমার হাত ধরে যতদূর বল যেতে পারব।”^{২৫}

অচলার এই কথার মধ্যে মহিমের সঙ্গে নতুন করে জীবন শুরু করার একটা প্রত্যাশা হয়তো ছিল, কিন্তু তার সেই প্রত্যাশায় জীবনের সম্পদন ধরা পড়ে না তার অন্তরের পাপবোধের চেতনা সক্রিয় থাকায় সে মহিমকে বলে—“তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই, কেউ ত আমার সঙ্গে কথা কবে না!”^{২৬}

অচলাকে ডিহরীতে একলা ফেলে মহিম চলে যেতে উদ্যোগী হলে অচলা তার কাছে একটা আশ্রম বা আশ্রয়ের সন্ধান জানতে চেয়েছিল —“শুনেচি বিলেত অঞ্চলে আমার মত হতভাগিনীদের জন্যে আশ্রম আছে, সেখানে কি হয় আমি জানি নে, কিন্তু এদেশে কি তেমন কিছু, — বলিতে বলিতে তাহার বড় বড় চোখ দুটি জলে টলমল করিতে লাগিল।”^{২৭}

মহিম অচলাকে কোন আশ্রম বা আশ্রয়ের সন্ধান দিতে পারে নি। তবে অচলা মৃণালের কাছে হয়তো আশ্রয়ের সন্ধান পাবে, কিন্তু সে আশ্রয়-ই, সেখানে জীবনের সম্পদন ধ্বনিত হবে না। ডিহরীতে ঝড়-জলের রাতে সুরেশের সঙ্গে রাত কাটানোর পরে অচলার পরিণতির অনিবার্যতায় আর কোনো সংশয় থাকে না — ঔপন্যাসিক তাকে প্রত্যাবর্তনহীনতার জগতে পৌঁছে দেন।

অচলা মহিমকে স্বামীত্বের আসনে বসিয়ে তাকে নিয়েই সুখী দাম্পত্যের নীড় গড়ে তুলতে চেয়েছিল— শুভদৃষ্টির সময় তার সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছিল। তবে কেন মহিম ও অচলার দাম্পত্যের নীড়ে ভিতর ও বাহির-উভয় দিক থেকেই জ্বলে পুড়ে যায়। উপন্যাসে দেখা যায় মহিম ও সুরেশের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণকে কেন্দ্র করেই অচলার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। আর এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বই মূলত দাম্পত্য-সম্পর্ককে ‘ভিতরও বাহির’— উভয় দিক থেকেই জ্বলে উঠতে সাহায্য করেছে। উপন্যাসে শেষে মহিমের অনুভব ব্যক্ত করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন—“এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনের উপর দিয়া যাহা বহিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন প্রলয়ের মত অসীম, তেমনি উপমাবিহীন।”^{২৮}

‘গৃহদাহ’ উপন্যাস ত্রিভূজ প্রেমের কাহিনি পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’ গল্প ও ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের সাদৃশ্য এবং পরোক্ষ প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপের সঙ্গে ‘গৃহদাহ’-এর অচলা, মহিম ও সুরেশের ব্যাপক সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। অবশ্য ‘ঘরে-বাইরে’-র বিমলা বা ‘নষ্টনীড়’-এর চারু র জীবন-সমস্যার সঙ্গে অচলার জীবন-সংকটের পার্থক্য প্রচুর। ভূপতির স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের বিষয়ে উদাসীন ছিল। নিজের কাজের বিষয়ে অধিক আগ্রহের জন্য সে স্ত্রীকে সময় দিতে পারে নি। তার উদাসীন্যের ছিদ্র পথ ধরে দেবর অমল প্রবেশ করেছে চারুর জীবনে। তার প্রাণবন্ত সঙ্গদানে চারুর হৃদয়ে প্রেমতৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে। অমলকে আশ্রয় করেই তার শূন্য হৃদয় পূর্ণতার পথ খুঁজে পেতে চায়। অমলের প্রতি আকর্ষণই ভূপতি-চারুর দাম্পত্যের নীড়-কে নষ্ট নীড়ে পরিণত করে। চারু নিজের অজান্তেই অমলকে ভালোবেসেছিল, অমলকেই মনে মনে তার হৃদয় সমর্পণ করেছিল। কিন্তু অচলা স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা মনের গভীরে পোষণ করেও সুরেশের দিকে এগিয়ে গেছে। সুরেশের প্রতি তার মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হলেও তার প্রতি তার মোহ-দুর্বলতাকে হৃদয়ের গভীরে প্রদেশ থেকে সমূলে উপরে ফেলতে পারে নি।

রাজপুরে মহিমের গৃহদাহের ঘটনার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অচলার জীবনের অদস বা আদিম প্রবৃত্তি আত্মসুখপরায়ণতা নীতির দ্বারা তাড়িত ফলে তার মধ্যে বহুবল্লভতার কামনা লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে প্রবৃত্তির অপপ্রতিরোধ্য শক্তি লক্ষ্য করা যায়। এক প্রেমপাত্র পরিবর্তন করে অন্যত্র সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খোঁজে। শরৎচন্দ্র মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অচলার বহুগামী মানসিকতার দিকটি যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কলকাতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত অচলা বিবাহ পূর্ব জীবনে দাম্পত্য-প্রেমের অমরাবতী রচনার স্বপ্ন দেখেছিল। পরিবেশের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেই সাধারণত ব্যক্তির চরিত্র এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা গড়ে ওঠে। পরিবেশ বলতে পরিবার ও পরিবারবৃত্তের অন্যান্য নর-নারী এবং অন্যান্য উপাদান যা ব্যক্তি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকেই বোঝাতে চেয়েছি। এক্ষেত্রে অচলার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা তাই আমাদের অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কেননা, অচলা ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা হওয়ায় স্বাধীন-ভাবে জীবন সঙ্গী নির্বাচন করার অধিকার সে অর্জন করেছিল। মহিমকে সে নিজেই জীবনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করে তাদের রাজপুরের বাড়িতে গিয়েছিল। রাজপুরে বসবাস কালেই গ্রাম্য ও শহুরে পরিবেশের বৈপরীত্য সে প্রথম অনুভব করে। শুধু তাই নয় মৃণালের ছুল রঙ্গ রসিকতা তার মনকে আহত করে। মৃণালের সম্পর্কে তার মনে ঈর্ষাবোধ জাগ্রত হয়। মহিমের আত্মমগ্ন মানসিকতাও আবেগহীন নিরুত্তাপ ব্যবহার ও শহুরে পরিবেশে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা অচলার মনে প্রবল ধাক্কা দিয়েছে।

রাজপুরের পরিপার্শ্বিকতা যখন অচলার মনকে বিষন্নতায় ভরিয়ে দিয়েছে তখনও মহিমকে বন্ধুর মতো অচলার পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় নি। মৃণাল-সম্পর্কে বিশেষত তার লেখা চিঠিকে কেন্দ্র করে অচলার মনের কোনে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করার জন্য মহিম কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে নি।

মহিমের প্রতি মৃণালের মনের গোপন কক্ষে যে একধরনের দুর্বলতা ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মৃণাল ও মহিম বাল্যকালে একই সঙ্গে বেড়ে ওঠায় তাদের পরস্পরের প্রতি একটা ভালোবাসা জন্ম নিয়েছিল। মহিমের সঙ্গে মৃণালের বিবাহের

কথাও উঠেছিল। কিন্তু বংশাভিজাত্যের কারণে তাদের বিবাহে বাধা সেধেছিল মহিমের বাবা। মৃণালের পিতা-মাতার মৃত্যু হলে মহিম তাদের আশ্রিতা মৃণালের বিবাহ দেয় পলাশী গ্রামের এক বৃদ্ধের সঙ্গে। হিন্দু নারীর স্বামী সংস্কারকে মেনে নিয়ে মৃণাল ভবানী ঘোষালকে গুরুর আসনে বসালেও মহিমের প্রতি তার প্রেম-ভালবাসাকে মন থেকে উৎপাটিত করতে পারে নি। তার সেই অবদমিত প্রেম ঠাট্টা-তামাশার ছদ্মরূপ ধরেই অচলার সামনে প্রকাশিত হয়েছে। মহিম সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের মানুষ হয়েও এ বিষয়ে এক প্রকার নির্বিকার থেকেছে, বেড়েছে অচলার ক্ষোভ — বিবাহিত দম্পতির জীবনে সমস্যা জট পাকাতে শুরু করেছে।

রুশ মনোবিজ্ঞানী আইভান পাওলভ (Ivan P. Pavlov) মানব মনের জটিলতার বিশ্লেষণে পরিবেশের প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসে দেখা যায়, অচলার মনে জটিলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। কলকাতার পরিবেশ থেকে অচলা মহিমকে ভালোবেসে স্বপ্নের নীড় রচনা করতে চেয়েছিল। আত্মীয়হীন গ্রাম্য পরিবেশে এসে তার মোহভঙ্গ ঘটেছিল এবং সাময়িকভাবে স্বামীর প্রতি মনে বিরূপতা জেগেছিল।

অচলার মন যখন মহিমের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ তখন রাজপুরে সুরেশের আবির্ভাব ঘটে। সুরেশ প্রবৃত্তি তাড়িত। অচলার প্রতি তার মোহ ইদ (Id) বা অদসেরই অভিব্যক্তি। তার (Super ego) বা অধিশাস্তা খুবই দুর্বল। বাল্যকালে মা বাবাকে হারিয়ে সে পিসিমার স্নেহ-ভালোবাসায় বেড়ে উঠেছে। পিসিমার প্রশয় ও অর্থ প্রাচুর্যের জন্য সুরেশের প্রবৃত্তির প্রাবল্য দিন দিন বেড়ে উঠেছে। পরম বন্ধু মহিমকে ব্রাহ্মকন্যা অচলার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাই সে নিজেই অচলার প্রতি সুতীর আকর্ষণ অনুভব করেছে। তার প্রবৃত্তি এতই দুর্বল হয়ে উঠেছে যে, সে বন্ধুর অবর্তমানে বন্ধুর ভাবী স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করতেও দ্বিধা করে নি। আসলে তার এই আত্মসুখ পরায়ণতা বা শিশুসুলভ স্বার্থপরতার মূলে যে পিসিমার স্নেহ প্রশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে কথা বলা-ই যায়। সুরেশের চরিত্রের সঙ্গে ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের মহেন্দ্র ও ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের সন্দীপের প্রবৃত্তিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মহেন্দ্র মায়ের

স্নেহ ভালবাসার প্রশ্নে বেড়ে ওঠায় আত্মকেন্দ্রিকতা ও শিশুসুলভ স্বার্থপরতাবোধ তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা গেছে। আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য সে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া অন্যের কথা কিছুমাত্র ভাবে নি। আর শিশু সুলভ স্বার্থপরতার জন্য আশা ও বিনোদিনী দুজনকেই নিজের অধিকারে রাখতে চেয়েছে। প্রবৃত্তি বা অদসের প্রভাবে মহেন্দ্রের মধ্যে দেখা দিয়েছে বহুবল্লভতার কামনা। সুরেশ ও মহেন্দ্রের বাস্তব বুদ্ধি বা ইগো দুর্বল। সন্দীপের প্রবৃত্তি বা অদসের তুলনায় ইগো বা অহং শক্তিশালী। তাই প্রবৃত্তিকে ইগো (ego) দ্বারা পরিচালিত করেছে। বাস্তব বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে স্থূল প্রবৃত্তিকে মহত্ত্বের আবরণে মুড়ে রেখেছে। মহেন্দ্র বা সুরেশ তা পারে নি।

সুরেশ প্রবৃত্তির তাড়িত হয়ে যে সব কাজ করেছে তার জন্য নিজেও পীড়িত হয়েছে, অপরকেও পীড়িত করেছে। সে নাস্তিক। কৃতকর্মের জন্য পাপ-পুণ্য বোধে সে বিশ্বাস করে না। তবে হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মদের কাছে হেরে যাক —তার মনে এতে সায় দেয় নি বলেই সে মহিমের উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তার রাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে মহিমকে বলেছে—“তুমি জান আমাদের সমাজের প্রতি আমার কত মমতা। সে সমাজকে যারা দেশের কাছে, বিদেশের কাছে, সকলের কাছে হেয় বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের ভাল তাদের থাক, আমার তারা শত্রু।”^{১২} কিন্তু ব্রাহ্ম অচলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই সে পরাজিত হয়। অচলার দৃষ্টিতে ‘স্থির-বুদ্ধির আভা’ সুরেশের মনকে টলিয়ে দেয়; তার মনে অচলাকে অধিকার করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

ঔপন্যাসিক সুরেশ চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ভাষায় ধরিয়ে দিয়েছেন, জটিল মনস্তত্ত্বের মোড়কে তাকে মুড়ে ফেলা হয় নি। আবেগ, অভিমান, অসংযম তার চরিত্রে উচ্চ মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। অহংবোধও তার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাই সে জীবনে চলার পথে হার স্বীকার করতে চায় নি। অচলাকে মহিমের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিজের অধিকারে আনবার জন্য সুরেশ যা যা করেছে, তাতে তার ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে। অচলার সঙ্গে সামান্য আলাপ পরিচয়ের পর তার শরীরে সংস্পর্শে এসে তীব্র আবেগে অচলার দুই হাত নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে

“সুরেশ সহসা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অচলার ডান হাত ধরিয়া টান দিল। সেই উন্মত্ত ও আকস্মিক আকর্ষণ সহ্য করা স্ত্রীলোকের সাধ্য নয়। সে উপর হইয়া সুরেশের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল।”^{৩০} এরপর “অচলার দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল, অচলা একটি বার ভূমিকম্পের এই প্রচণ্ড হৃদস্পন্দন নিজের দুটি হাতে অনুভব করে দেখ — কী ভীষণ তাড়ন এই বুকের ভেতরটায় তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।”^{৩১} কৈদার বাবুর চার হাজার টাকার ঋণ মিটিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

কৈদার বাবুর ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে সুরেশ ভেবেছিল অন্তত কৃতজ্ঞতার কারণে অচলা তাকে ভালোবাসবে। এরপর অচলার আচরণ দেখে তার মনে হয়েছিল, অচলার হৃদয়কে জয় করে নিয়েছে। উপন্যাসে এর সমর্থন আছে। সুরেশ অচলাকে বলে—“তোমাকে পাব না মনে হলেই আমার পায়ের নীচে মাটি পর্যন্ত টলতে থাকে।”^{৩২} প্রতিক্রিয়ায় অচলা “মুহূর্তের করুণায় সে কোনদিন যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিয়া বসিল। সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া তাহার (সুরেশের) অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন।”^{৩৩} এরপর ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর মহিম এসে উপস্থিত হলে অচলা সুরেশের প্রতি দৌর্বল্য কাটিয়ে উঠে মহিমকেই জীবনসঙ্গী রূপে নির্বাচন করে। ক্ষুব্ধ সুরেশ কৈদারবাবু ও অচলাকে অপমান করে চলে যায় — এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সুরেশের বেপায়া হয়ে যাবার কিছুদিন পর একদিন সংবাদপত্রে তার খবর প্রকাশিত হয় — ফয়জাবাদে প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রজ্জ্বলিত গৃহ থেকে রোগশয্যায় শায়িত স্ত্রীলোককে সুরেশ উদ্ধার করেছে। এই সক্রিয়তা হল মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় উদ্গতি বা (Sublimation)। অচলাকে না পেয়ে সে তার অবরুদ্ধ বা নিষিদ্ধ ইচ্ছাকে কল্যাণমূলক কর্ম অর্থাৎ সমাজ সেবার দিকে চালিত করেছে। পরের বিপদে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা সুরেশের ছেলে

বেলাকার স্বভাবের মধ্যেই ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অচলার মোহ দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে। জ্বলন্ত গৃহে প্রবেশ করে রোগীকে উদ্ধার করতে গিয়ে সুরেশের পিঠ পুড়ে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। কৈদার বাবুর বাড়িতে সুরেশের অসতর্ক অবস্থায় ক্ষতের ব্যান্ডেজ খুলে যায়। তখন “তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া আসিয়া ব্যান্ডেজ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ভয় কি, আমি ঠিক করে বেঁধে দিচ্ছি। বলিয়া তাহাকে ও-ধারের সোফার উপর বসাইয়া দিয়া, সমস্ত সাবধানে ব্যান্ডেজটা যথাস্থানে বাঁধিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল।”^{৩৪}

অচলার বিবাহের পরে সুরেশ রাজপুর মহিমের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল প্রবৃত্তির দুর্বার টানে। সে অচলার প্রতি তার প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে অবদমনের জন্য সমাজ-সেবামূলক কর্মে বাঁপিয়ে পড়ে নিষিদ্ধ ইচ্ছাকে অসামাজিক লক্ষ্য হতে সরাতে চেয়েছিল কিন্তু তার পরাভবের যন্ত্রণাকে সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। তাছাড়া অচলার নারী সুলভ মমত্ববোধ বা সাময়িক দুর্বলতাকে সে তার প্রতি অচলার প্রগাঢ় অনুরাগ বলে ভুল করে।

অনাহত সুরেশ মহিমের বাড়িতে গিয়েছিল বন্ধু ও বন্ধু পত্নীর নতুন সংসার দেখার জন্য নয়। তার তীব্র কামনা, অলীক আশায় মায়াবী আকর্ষণেই সে সেখানে যায়। সেখানে উপস্থিত হয়ে সুরেশ মহিম অচলার দাম্পত্য-সম্পর্কে দ্বন্দ্বময়তার দিকটি দেখতে পায়। ঐ সময় অচলার মন মহিমের প্রতি সাময়িকভাবে বিরূপ ছিল তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কিছুটা দূরত্ব ও সৃষ্টি হয়েছিল। সুরেশ অচলার আচার আচরণ দেখে অনুমান করল অচলার মনের কোনে তার আসনটি পাতা আছে। এসব কিছু অনুমানের পিছনে সত্য যে কিছু মাত্র ছিল না, এমন নয়। কিন্তু তার সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হওয়ায় তার মন আবার অচলা অভীমুখীন হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়েই সুরেশের উদ্দেশ্যে অচলা বলেছে “তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না সুরেশবাবু; কিন্তু তুমি ছাড়া আর আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নাই। সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও — যাকে ভালবাসি নে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না।”^{৩৫}

অচলার মনের এই রক্তপথেই অশুভ গ্রহের মতো সুরেশের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিপর্যস্ত হয়েছে তাদের দাম্পত্য জীবন—‘গৃহ’ ভিতর বাহির উভয় দিক থেকেই দন্ধ হয়েছে।

মহিম-অচলার দাম্পত্যের ট্রাজিক পরিণতির জন্য সুরেশের অপপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তি কিছুটা দায়ী। কিন্তু সর্বাংশে সুরেশকে দায়ী করা যায় না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— “গৃহদাহের জন্য সুরেশের দায়িত্ব সত্যসত্যই আছে কিনা তাহা লেখক সম্পৃক্তঃ নির্দেশ করেন নাই। একবার মাত্র অচলা সুরেশকে এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু তখন সে সর্বনাশের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া, সুতরাং ইহাই যে তাহার আন্তরিক বিশ্বাস তাহা ঠিক বলা যায় না।”^{৩৬}

রাজপুরের বাড়ীতে আগুন লাগানোর জন্য অচলার অভিযোগের ভিত্তিতে সুরেশকে নিশ্চিত ভাবে অপরাধী ভাবা যায় না — এ কথা ঠিক। কিন্তু দাম্পত্যের নীড় নষ্টের জন্য সে তার দায়কে স্বীকার করে নিয়ে মৃত্যুর পূর্বে মহিমকে জানিয়েছে যে, তার ভুল হয়েছিল, অচলা যে মহিমকে খুব ভালোবাসত তা সে বুঝতে পারে নি, এমন কি মহিমও বুঝতে পারে নি।

রাজপুরে গিয়ে নববধূ অচলার মনে বিরূপতা সৃষ্টি হলেও সে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে স্বাভাবিক করার সুযোগ মহিমকে দিয়েছিল। কিন্তু মহিমের বিবেচনাবোধের কারণে তাদের সম্পর্কে স্বাভাবিকতা ফিরে এল না। মহিম যে মৃণাল প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে অচলার উত্তপ্ত হৃদয়ে শীতলতার প্রলেপ দিতে অগ্রসর হয় নি আমরা জানি। তার একান্তই অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য সে গান্ধীর্ষে অটল থেকেছে। অটল গান্ধীর্ষ নির্বাক সহিষ্ণুতা, উচ্ছাসহীন মিতভাষণ তার চরিত্রের গুণ হতে পারে কিন্তু দাম্পত্যের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সহানুভূতি, সহমর্মিতাবোধ আলাপচারিতা প্রভৃতি গুণের বিশেষ প্রয়োজন হয়। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই সুখী-দাম্পত্যের নীড় রচিত হয়। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষেত্রেই (বিশেষত গৃহদাহের পর) মহিম অচলাকে সহযোগী ভাবে পেতে পারে নি। এক্ষেত্রে সুরেশ তাদের সম্পর্কের ভঙ্গুরতার কথা ভাবতেই পারে। অচলাও তার বিষয়ে মহিমের আগ্রহহীনতার কথা ভাবতে পারে। মহিম অচলার

সঙ্গে কখনো তার সুখ-দুঃখ শেয়ার করে নি। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা-মেলা আলাপ-আলোচনার পরিচয়ও উপন্যাসে নেই। সুরেশের বাড়িতে অবশ্য অসুস্থ অবস্থায় অচলাকেই মহিম পরম নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছিল।

মহিমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা হীনতাবোধের ধারণা (Inferiority complex) সৃষ্টি হয়েছিল বাল্য কালেই। তাই তাকে সব সময়ে নিজের মধ্যে এক প্রকার গুটিয়ে থাকতে দেখা যায়। হীনমন্যতাবোধের জন্যই সে কখনোই বন্ধু সুরেশের সঙ্গে বিরোধের সময় যুক্তির মাধ্যমে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। তার জীবনে আবেগ উচ্ছ্বসের কোনো সন্ধান নেই। তার হীনমন্যতাজাত অত্যধিক বিনয় সুরেশ এবং অচলাকে পরস্পরের কাছে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। মহিমের নিরুত্তাপ ব্যবহারের জন্য অচলাও মহিমকে ঠিক বুঝতে পারে নি। এর পরিচয় ফুটে উঠেছে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে অচলা ও মহিমের কথোপকথনে —“অচলা অশ্রু-বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যতদূর সাধ্য সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া চুপি চুপি বলিল, তুমিও ত ভালবাসো না।

মহিম আশ্চর্য হইয়া কহিল, এ কথা কে বললে? আমি ত কখনো বলিনি।

অচলার উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না; কহিল, শুধু কথাই কি সব? শুধু মুখের বলাই সত্যি, আর সব মিথ্যে? রাগের মাথায় মনের কষ্টে যা কিছু মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকেই কেবল সত্যি ধরে নিয়েই তুমি জোর খাটাতে চাও? তোমার মতন নিজের ওজনে কথা বলতে না পারলেই কি তার মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে? বলিতে বলিতেই তাহার গলা ধরিয়া প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। মহিম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, তার মানে? অচলা উচ্ছ্বসিত রোদন চাপিয়া বলিল, মনে করো না—তোমার মত সাবধানী লোকেও মিথ্যেকে চিরকাল চাপা দিয়ে রাখতে পারে! তোমারও কত ভুল হতে পারে— দেখ গে চেয়ে, তোমারই টেবিলের ওপর।”^{৩৭}

অচলার জীবনে গুরুতর সমস্যা ও তার জীবনের ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন—“অচলার সচেতন বুদ্ধি যাহা বুঝাইয়াছে তাহার গুহাতিত আত্মা অজ্ঞাতসারে ঠিক তাহার বিপরীত প্রবৃত্তি জাগাইয়াছে।”^{৩৮}

‘আনা কারেনিনা’ উপন্যাসে আনা মাতৃত্ব ও নারীত্বের দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে নি বলেই তার জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসেও দুই বন্ধু-মহিম ও সুরেশের মধ্যে যে কোনো একজনকে অচলা হৃদয় সমর্পণ করতে পারে নি। তাই তাকে ব্যর্থ জীবনের গ্লানি বহন করে চলতে হয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় বিবাহিত আনা ভ্রণস্থির (Vronsky-র) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। স্বামীর প্রতি তার বিরূপতা ছিল না। অচলার ভালবাসা ছিল মহিমের প্রতি। প্রবৃত্তির তাড়নায় সুরেশের প্রতিও সে অদৃশ্য একটা আকর্ষণ অনুভব করেছে। তবে ভ্রনস্থির প্রতি আনার দুর্বলতার সঙ্গে সুরেশের প্রতি অচলার দুর্বলতা একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। মহিম ও সুরেশ দু’জন পুরুষকেই অচলা হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল। সুরেশকে কেন্দ্র করে আবার তার হৃদয়ে সুরেশের প্রতি আকর্ষণ বিকর্ষণের খেলাও চলেছে। একই সঙ্গে অচলা সুরেশকে ভালোবেসেছে আবার ঘৃণাও করেছে। একই সঙ্গে মনে প্রেম-ঘৃণা, আগ্রহ-ঔদাসীণ্য প্রভৃতি বিপরীত ধর্মী ভাবের সমাবেশকে সমস্তত্ত্বের পরিভাষায় উভাবেগ বা Ambivalence বলে। অচলার চরিত্রে এই ভাবটির প্রকাশ ঘটায় তার চরিত্র জটিলতর হয়ে উঠেছে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সুরেশের প্রতি অচলার আকর্ষণ যেমন সত্য, তেমনি বিকর্ষণও সমান সত্য। সুরেশের ঔদার্য, আবেগ কখনও অচলার চোখে জল ঝরিয়েছে, কখনও বা তার আবেগের উদ্দামতায় অচলা ভীত সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে — মহিমকে অনুরোধ করেছে তার রাক্ষস বন্ধুর (সুরেশের) হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রসঙ্গে শ্রী-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিমত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—“মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক দিয়া গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয় মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার দোলাচল চিত্তবৃত্তি। দিগদর্শন যন্ত্রের কাঁটার মত স্ত্রীর মন সর্বদা অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর দিকেই ফিরিয়া থাকে, ইহা আমরা পুরাণ কাহিনি বা রোমান্সে পাইয়া থাকি। কিন্তু বাস্তব জীবনে এই যে নিষ্ঠার এতটুকু নড়চড় হয় না, চিত্ত মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ-দোলায় দোলায়িত হয় না, ইহা জোর করিয়া বলা যায়

না। দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আকর্ষণে অচলার মনে এইরূপ একটা দ্বিধা অনিশ্চয়ের ভাব যে জাগিয়াছে তাহা নিশ্চিত। এক দিকে মহিমের শান্ত, একান্ত ভাবাবেগহীন, প্রস্তর কঠিন আবেদন— অপর দিকে সুরেশের ব্যগ্র-ব্যকুল, উন্মত্ত আবেগ — এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝে অচলার হৃদয় দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে।”^{৩৯}

অচলার এই দোলাচল চিত্তবৃত্তির মধ্যেই ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসের আধুনিকতা ও অভিনবত্ব প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দিকের রচনা ‘বিরাজ বৌ’, ‘চন্দ্রনাথ’ বড়দিদি প্রভৃতি উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নারীর নৈতিক শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য নির্জ্ঞান আকাঙ্ক্ষার অবদমনের দিকটিকেই বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসে অচলা চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ফ্রেয়েডীয় মনো বিকলন পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা প্রেমের নতুন দেহবাদী বাস্তব বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলেন। ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী, রক্ষণশীল শরৎচন্দ্র উপন্যাসটিতে অচলার অসংযমী প্রেমের অবস্থানকে যে সাহসী সততায় প্রকাশ করেছেন তাতে তাঁর দুঃসাহসিকতা ও আধুনিক মনস্তত্ত্ব-সচেতনতার পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

উৎস সূত্র

- ১। উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৩০।
- ২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি., অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ২৩৭।
- ৩। বিরাজ বৌ, শরৎ রচনাবলী (৩য় খণ্ড), জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সাহিত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩, পৃ. ৪।
- ৪। তদেব; পৃ. ৭।
- ৫। তদেব; পৃ. ৮।
- ৬। তদেব; পৃ. ৪৩-৪৪।
- ৭। তদেব; পৃ. ৪৪।
- ৮। তদেব; পৃ. ৪৪।
- ৯। তদেব; পৃ. ৫১।
- ১০। তদেব; পৃ. ৫২।
- ১১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি., অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ২৫৯।
- ১২। গৃহদাহ, শরৎ রচনাবলী, (চতুর্থ খন্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সমিতি, কলকাতা-০৯, পৃ. ২২৫।
- ১৩। শরৎচন্দ্রঃ পুনর্বিচার, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১০, পৃ. ৭৪।

১৪। গৃহদাহ, শরৎ রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সমিতি,
কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩, পৃ. ২৬০।

১৫। তদেব; পৃ. ২৭৪।

১৬। তদেব; পৃ. ২৯৭।

১৭। তদেব; পৃ. ২৮৭।

১৮। তদেব; পৃ. ২৩৮।

১৯। তদেব; পৃ. ২৩৬।

২০। তদেব; পৃ. ৩২৯।

২১। তদেব; পৃ. ৩৪৯।

২২। তদেব; পৃ. ৩৬৯।

২৩। তদেব; পৃ. ৩৮৩।

২৪। তদেব; পৃ. ৩৯৮।

২৫। তদেব; পৃ. ৩৯৮।

২৬। তদেব; পৃ. ৩৯৮।

২৭। তদেব; পৃ. ৩৯৯।

২৮। তদেব; পৃ. ৩৯৯।

২৯। তদেব; পৃ. ২৩৫।

৩০। তদেব; পৃ. ২৪৮।

৩১। তদেব; পৃ. ২৪৮।

৩২। তদেব; পৃ. ২৫৬।

৩৩। তদেব; পৃ. ২৫৭।

৩৪। তদেব; পৃ. ২৭০।

৩৫। তদেব; পৃ. ২৯৬-৯৭।

৩৬। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা.
লি., অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ২৫৬।

৩৭। গৃহদাহ, শরৎ রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সমিতি,
কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩, পৃ. ৩০০।

৩৮। শরৎচন্দ্র (সমালোচনা সাহিত্য), সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জি এ্যান্ড কোং
প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩, অষ্টাদশ সংস্করণ, ১৪১৪, পৃ. ৫১।

৩৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা.
লি., অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ২৫৭।